নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ

দারিদ্র্য ও বৈষম্য বিশ্লেষণ

সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা

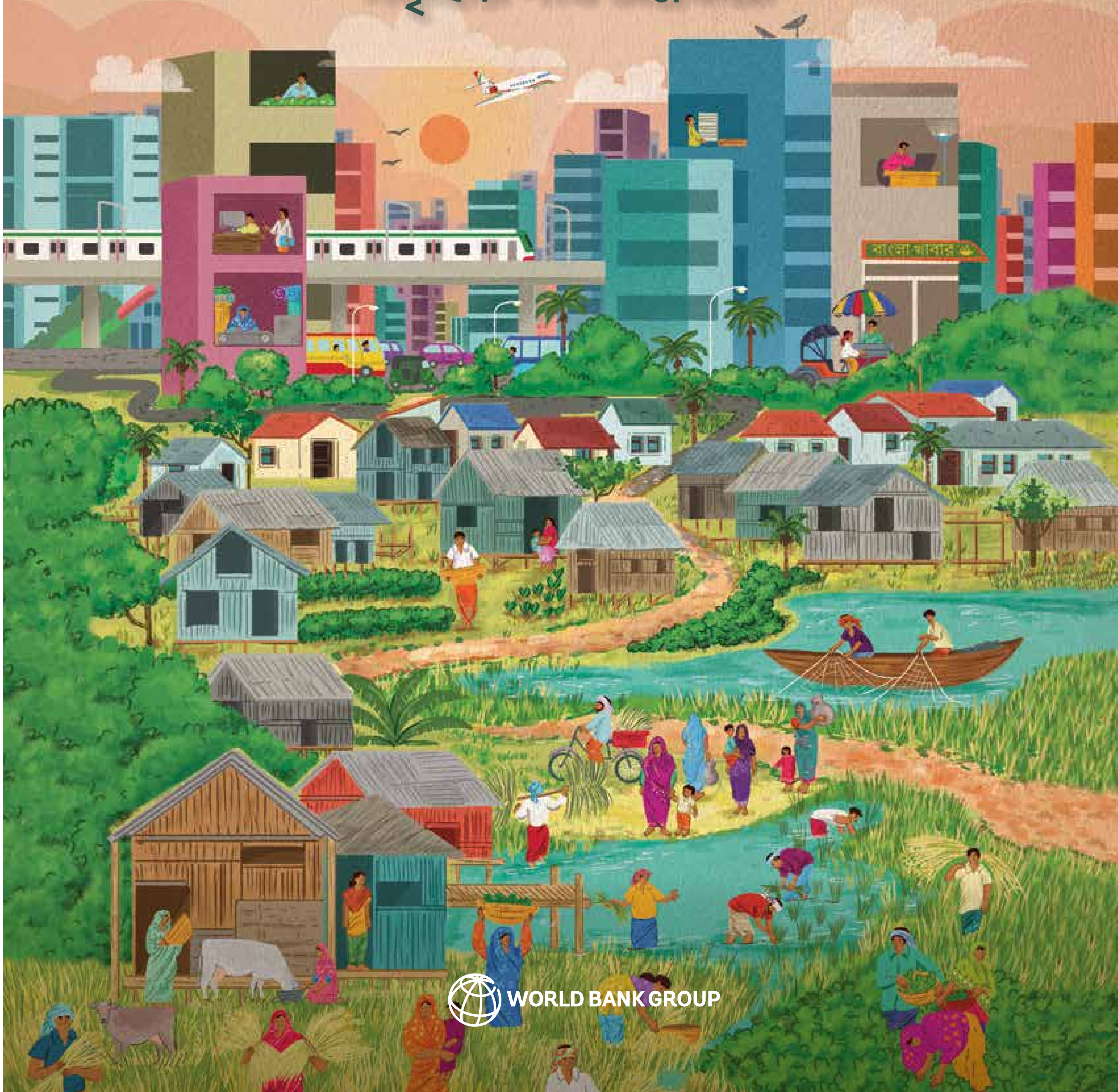

WORLD BANK GROUP

EXECUTIVE SUMMARY
নির্বাহী সারসংক্ষেপ

BANGLADESH
Poverty and Equity Assessment
NAVIGATING THE ROAD TO PROSPERITY

বাংলাদেশ
দারিদ্র্য ও বৈষম্য বিশ্লেষণ
সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা

© ২০২৫ বিশ্বব্যাংক

১৮১৮ এইচ স্ট্রিট এনডব্লিউ, ওয়াশিংটন, ডিসি ২০৪৩৩
টেলিফোন: ২০২-৪৭৩-১০০০; ইন্টারনেট: www.worldbank.org

সত্ত্ব সংরক্ষিত

এই কাজটি বিশ্বব্যাংকের কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টার ফল। এখানে উপস্থাপিত অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা ও উপসংহার বিশ্বব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ অথবা তারা যে দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অপরিহার্যভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত তথ্যের নির্ভুলতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করে না। এই কাজের অন্তর্ভুক্ত যেকোনো মানচিত্রে প্রদর্শিত সীমানা, রং, নাম বা অন্যান্য তথ্য কোনো ভূখণ্ডের আইনি অবস্থান সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের মতামত, অথবা উক্ত সীমানার প্রতি তার সমর্থন বা স্বীকৃতি নির্দেশ করে এমনটি বোঝায় না।

সত্ত্ব এবং অনুমতি

এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত উপকরণ কপিরাইটের আওতাভুক্ত। বিশ্বব্যাংক তার জ্ঞান বিস্তারকে উৎসাহিত করে; তাই যথাযথ উৎসনির্দেশসহ, শুধুমাত্র অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই কাজ আংশিক বা পূর্ণরূপে পুনরুৎপাদন করা যেতে পারে।

উৎসের স্বীকৃতি

অনুগ্রহ করে এই কাজটি নিম্নরূপ উল্লেখ করুন:

বিশ্বব্যাংক। ২০২৫। বাংলাদেশ দারিদ্র্য ও বৈষম্য মূল্যায়ন: সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা।
ওয়াশিংটন ডিসি, বিশ্বব্যাংক।

অধিকার ও লাইসেন্স সংক্রান্ত সব ধরনের জিজ্ঞাসা, যার মধ্যে সাবসিডিয়ারি
অধিকারও অন্তর্ভুক্ত, পাঠাতে হবে:

বিশ্বব্যাংক পাবলিকেশনস, দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ, ১৮১৮ এইচ স্ট্রিট এনডব্লিউ,
ওয়াশিংটন, ডিসি ২০৪৩৩, ইউএসএ-এর ঠিকানায়।
ফ্যাক্স: ২০২-৫২২-২৬২৫
ইমেইল: pubrights@worldbank.org

বহিরাবরণের চিত্রাঙ্কন: Manthra Comunicación · info@manthra.ec

ভূমিকা

২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতি অর্জন করেছে, যদিও ২০১৬ সালের পর থেকে এই অগ্রগতির গতি কিছুটা মন্থর হয়েছে। ২০১০ থেকে ২০২২ সময়কালে প্রকৃত জিডিপি গড়ে প্রতিবছর ৬.৬ শতাংশ হারে বেড়েছে, ফলে মাথাপিছু জিডিপি প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি পৌঁছেছে। একই সময়ে জাতীয় উচ্চ দারিদ্র্যসীমায় দারিদ্র্যের হার ৩৭.১ শতাংশ থেকে কমে ১৮.৭ শতাংশে নেমে এসেছে, যার ফলে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। চরম দারিদ্র্যের হার ১২.২ শতাংশ থেকে কমে ৫.৬ শতাংশে নেমেছে, অর্থাৎ প্রায় ৯০ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছে। বহুমাত্রিক দারিদ্র্যও দ্রুত কমেছে, ৪৬.৮ শতাংশ থেকে ২১.৩ শতাংশে, যার অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, বাসস্থান ও বিদ্যুৎপ্রাপ্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ৩ কোটি ৪০ লাখ বাংলাদেশির জীবনমানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

এই অর্জনে একাধিক উপাদান একযোগে কাজ করেছে। দারিদ্র্য হ্রাসের অর্ধেকেরও বেশি এসেছে শ্রম আয়ের মাধ্যমে; প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পনির্ভর প্রবৃদ্ধি বড় ভূমিকা রেখেছে, আর ২০১৬ এর পর থেকে কৃষিখাতের অবদান আরও বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক ভর্তুকি ও নগদ হস্তান্তর দারিদ্র্য হ্রাসের প্রায় ৫ শতাংশের পেছনে অবদান রাখলেও কারা, কতটা সহায়তা পাচ্ছেন এই কাভারেজ ও লক্ষ্যনির্ধারণে (টার্গেটিং) উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়ে গেছে। অভিবাসনও পরিবারগুলোর জন্য একধরনের সুরক্ষাবলয় তৈরি করেছে: অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স দারিদ্র্য হ্রাসে ১.৩ শতাংশ পয়েন্ট এবং আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স প্রায় ২ শতাংশ পয়েন্ট অবদান রেখেছে, একত্রে যা দারিদ্র্য প্রায় ৩.৩ শতাংশ পয়েন্ট কমাতে সহায়তা করেছে।

তবুও বাংলাদেশের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জ এখনো বড়। ২০২২ সালেই দারিদ্র্যে পতিত হওয়ার ঝুঁকি ছিল উচ্চ, এবং বর্তমানে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ এ ধরনের ঝুঁকির মুখে রয়েছে; একই সঙ্গে প্রায় প্রতি তিনজনের একজন বাড়তি জলবায়ু ঝুঁকির সম্মুখীন। গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাসের গতি শহরের তুলনায় দ্রুত হলেও ২০২২ সালে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার এখনো শহরের তুলনায় ৬ শতাংশ-পয়েন্ট বেশি ছিল। শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসের গতি তুলনামূলকভাবে মন্থর, পাশাপাশি বৈষম্য বেড়েছে এবং যানজট, দুর্বল কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সেবার নিম্নমানসহ নানা কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে শ্রমবাজারের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ২০১৬ সালের পর থেকে কাজের পরিবেশ ও মানের অবনতি ঘটেছে, এবং তরুণদের বেকারত্ব উচ্চই রয়ে গেছে- তরুণ নারীদের মধ্যে বেকারত্ব ১৮ শতাংশ, আর তরুণ পুরুষদের ক্ষেত্রেও এ হার ঊর্ধ্বমুখী। নতুন সৃষ্ট কৃষি-কর্মসংস্থানের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই দখল করেছেন তরুণ নারীরা, যারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বল্প মজুরির কাজে নিয়োজিত এবং পুরুষের তুলনায় প্রায় অর্ধেক আয় করছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপ প্রবৃদ্ধির গতি আরও মন্থর করেছে এবং ঝুঁকি বাড়িয়েছে। অর্থবছর ২০২৫-এ প্রবৃদ্ধি কমে ৪.০ শতাংশে নেমে এসেছে-যা প্রায় দুই দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমা (২০২১ সালের পিপিপি অনুযায়ী দৈনিক ৩ ডলার) অনুসারে দারিদ্র্যের হার বেড়ে ৮.৯ শতাংশে পৌঁছানোর আশঙ্কা রয়েছে; ফলে আরও প্রায় ১২ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যে পতিত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। কর্মসংস্থানের পরিস্থিতিও অবনতি হয়েছে, যেমন শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার কমেছে: ২০২৪ সালে কর্মসংস্থান-জনসংখ্যা অনুপাত নেমে এসেছে ৫৬.৭ শতাংশে, যেখানে চাকরি হারানোর ধাক্কা সবচেয়ে বেশি লেগেছে সেবা খাতে, এবং নারী ও তরুণ কর্মীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

এই প্রতিবেদনের ফলাফল ভবিষ্যতের অগ্রগতি পুনরুজ্জীবিত ও বিস্তৃত করার জন্য কয়েকটি নীতিগত অগ্রাধিকার তুলে ধরে, যেমনঃ

- টেকসই উপায়ে জমিতে ফসল ও কর্মকাণ্ডের বহুমুখীকরণে সহায়তা এবং কৃষিভিত্তিক মূল্যশৃঙ্খল অবকাঠামোয় বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি করা।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তৃত করা এবং নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ও তরুণদের চাকরিকে উৎসাহিত করা। নিরাপদ ও সাশ্রয়ী শিশুদিবাযত্নকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা সনদ কর্মসূচির প্রসার এর জন্য কার্যকর প্রদক্ষেপ হতে পারে।
- সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং উচ্চ জলবায়ুঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিয়ে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।
- শিক্ষা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও কৃষি সম্প্রসারণ সেবার মতো মূল সেবার মান উন্নত করা, যাতে দারিদ্র্য হ্রাস ও সামগ্রিক কল্যাণে এসব সেবার প্রভাব সর্বোচ্চ করা যায়।

২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য ও বহুমাত্রিক বঞ্চনা উভয় ক্ষেত্রেই কয়েক কোটি মানুষের জন্য উত্তরণের সুযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু দারিদ্র্য হ্রাসের গতি শ্লথ হওয়া, বাড়তে থাকা বৈষম্য এবং ক্রমবর্ধমান জলবায়ু ঝুঁকি আগামী পথচলাকে আরও জটিল করে তুলছে। সুস্পষ্ট, দূরদর্শী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ একদিকে প্রবৃদ্ধিকে টেকসই রাখতে পারে, অন্যদিকে তা যেন অঞ্চল, লিঙ্গ ও প্রজন্মের ভেদাভেদ ছাড়াই সবার মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয়, তা নিশ্চিত করতে পারে।

জ্যাঁ পেম
বাংলাদেশ ও ভুটানের জন্য বিশ্বব্যাংকের বিভাগীয় পরিচালক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই *পোভার্টি অ্যান্ড ইকুইটি অ্যাসেসমেন্ট* প্রতিবেদনটি বহু পক্ষের মূল্যবান মতবিনিময় ও অবদান ব্যতীত সম্ভব হতো না, যার মধ্যে আছেন সরকারি নীতি-নির্ধারক, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, একাডেমিয়া, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিরা। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস (বিবিএস) এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি; তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ে তাঁদের নিষ্ঠা ও সহায়তা এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই ড. শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি (সাবেক সচিব, এসআইডি), মো. মতিয়ার রহমান (সাবেক মহাপরিচালক, বিবিএস), মিস আলেয়া আক্তার (বর্তমান সচিব, এসআইডি) এবং মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (বর্তমান মহাপরিচালক, বিবিএস)-এর প্রতি।

এই প্রতিবেদনটির যৌথ নেতৃত্বে ছিলেন সার্জিও অলিভিয়েরি (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, ইএসএপিভি) এবং আয়াগো ওয়ামবিলে (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, ইএসএপিভি)। মূল টিমে ছিলেনঃ ইভান গাশে (কনসালট্যান্ট, ইএসএপিভি), আগুস্তিন আরাকাকি (কনসালট্যান্ট, ইএসএপিভি), হাইমে ফের্নান্দেজ (ডাটা সায়েন্টিস্ট, ইএসএপিভি), ভারজিলিও গালদো (কনসালট্যান্ট, ইএসএপিভি), এফএনইউ জোনায়েদ (রিসার্চ অ্যানালিস্ট, ইএসএপিভি), রুমানা ইসলাম (কনসালট্যান্ট, এসএসএএস১), নেথ্রা পালানিস্বামী (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, ইএসএপিভি), কারমেন দে পাজ (কনসালট্যান্ট, ইএসএপিভি), নাটালিযয়া পেকোরারি (কনসালট্যান্ট, ইএসএপিভি), লেওপোলদো তোরনারোল্লি (কনসালট্যান্ট, ইএসএপিভি), জিওভান্নি রাজ্জু (কনসালট্যান্ট, ইএসএপিভি) এবং ফয়েজউদ্দিন আহমেদ (কনসালট্যান্ট, ইএসএপিভি)।

বিস্তৃত টিমে ছিলেন বার্নার্ড হেভেন (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, ইএলসিএমইউ), ধ্রুব শর্মা (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, ইএসএসি২), নাজমুস সাদাত খান (ইকোনোমিস্ট, ইএসএসি২), মাউরিজিও বুস্সোলো (লিড ইকোনোমিস্ট, সারসে), হুয়ানমিন হু (ইয়াং প্রফেশনাল, এইচএসএই২), ন্যানসি লোজানো (প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডিইসিজিআই), ইসিস গ্যাড্ডিস (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, এসএসএএস১) এবং মোস্তাফা আমির সাব্বিহ (সোশ্যাল প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট, এইচএসএএসপি)। আমরা আরও কৃতজ্ঞ অলিভার বাল্ক (কনসালট্যান্ট, জিপিভি৪) এবং আলেকজান্ডার আরউইন (কনসালট্যান্ট, জিপিভি৪)-এর প্রতি, পুরো নথিটির উৎকৃষ্ট এডিটিং এর জন্য; একই সঙ্গে আমপারো লেজামা (প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইএসএপিভি), মো. ফারুক হোসেন (প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট, এসিএসবিডি) এবং বিভূতি চাকমার অসাধারণ প্রশাসনিক সহায়তার জন্য।

প্রতিবেদনের বিভিন্ন অধ্যায়ে মন্তব্য ও অবদানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই জাভিয়ের বায়েজ (লিড ইকোনোমিস্ট, ইএইপিভি), অলিভিয়া দাউস্ট (সিনিয়র আরবান ইকোনোমিস্ট, আইএলসিইউআর), মারিয়া দাভালোস (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, ইএলসিপিভি), ডায়ানা তেল্লো (আরবান স্পেশালিস্ট, আইএইইউ২), মারিয়া ইউজেনিয়া জেনোনি (লিড ইকোনোমিস্ট, ইপিভিজিই), গুস্তাভো কানাভিরে (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, ইএলসিপিভি), ইম্মানুয়েল স্কুফিয়াস (লিড ইকোনোমিস্ট এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরএর এলকেওয়াই স্কুল অব পাবলিক পলিসি এর ভিজিটিং প্রফেসর), মনসেররাত সেরিও (ইকোনোমিস্ট, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি লা প্লাতা, আর্জেন্টিনা), আন্দ্রেস হাম (অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লস আন্দেস ইউনিভার্সিটি, কলম্বিয়া) এবং পোভার্টি ডিপার্টমেন্ট এর গ্লোবাল সলিউশন গ্রুপ এর মিটিংগুলোতে অংশগ্রহণকারী সকল সহকর্মীর প্রতি। ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারগুলো রিভিউ করেছেন পল কোরাল (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, ইএএসপিভি), নোবুয়ো ইয়োশিদা (লিড ইকোনোমিস্ট, ইপিভিজিই), ডেভিড নিউহাউস (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, ডিইসিডিএ), হোসে কুয়েস্তা (লিড ইকোনোমিস্ট, এসএসআইডিআর) এবং আলেকসান্দ্রু কোজোকারু (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, ইইসিপিভি)।

পলিসি ম্যাট্রিক্সটি সমৃদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন সেক্টর থেকে প্রাপ্ত অবদানে, বিশেষভাবেঃ ফেই দেং (প্র্যাকটিস ম্যানেজার, আইএসএটি১), কেইকো ইনোয়ে (প্র্যাকটিস ম্যানেজার, এইচএসএই১), এস. আমের আহমেদ (লিড ইকোনোমিস্ট, এইচএসএএসপি), মোস্তাফা আমির সাব্বিহ (সোশ্যাল প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট, এইচএসএএসপি), অভিরূপ সরকার (সোশ্যাল প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট, এইচএসএএসপি), শ্রেয়ানা ভট্টাচার্য (সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট, এইচএসএএসপি), তানজিনা কুদ্দুস দিনা (কনসালট্যান্ট, এইচএসএএসপি), শ্রী কুমার তাদিমাল্লা (লিড ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিস্ট, আইএসএটি১), নুসরাত নাহিদ বাবি (সিনিয়র ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিস্ট, আইএসএটি১), বি কে এম আশরাফুল ইসলাম (ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিস্ট, আইএসএটি১), সৈয়দ রাশেদ আল-জায়েদ জোশ (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, এইচএসএই১), মো. মনসুর আহমেদ (সিনিয়র ইকোনোমিস্ট, এসএজিজিএল), আমাদু বা (সিনিয়র এগ্রিকালচার ইকোনোমিস্ট, এসএসএএ১) এবং সন থান ভো (সিনিয়র এগ্রিকালচার স্পেশালিস্ট, এসএসএএ১)।

প্রতিবেদনটি উপকৃত হয়েছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এ আয়োজিত সেমিনার এবং ৭-১০ ডিসেম্বর ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত এবিসিডি কনফারেন্স-এর আলোচনা থেকে। আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ড. বিনায়ক সেন (সাবেক মহাপরিচালক, বিআইডিএস), ড. এ কে এনামুল হক (বর্তমান মহাপরিচালক, বিআইডিএস), ড. মোহাম্মদ ইউনুস (রিসার্চ ডিরেক্টর, বিআইডিএস), ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ (বর্তমান পরিকল্পনা উপদেষ্টা), ড. দীপঙ্কর রায় (যুগ্ম সচিব, এসআইডি), হোসেন জিল্লুর রহমান (নির্বাহী পরিচালক, পিপিআরসি), আহসান এইচ. মনসুর (গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক), বজলুল হক খন্দকার (চেয়ারম্যান, সানেম), জায়েদি সাত্তার (চেয়ারম্যান, পিআরআই), অতনু রাব্বানী (অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ (সিনিয়র ফেলো, পিপিআরসি) এবং ইমরান মতিন (নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)-এর প্রতি যাঁরা ওয়ার্কশপ ও একাধিক মিটিংয়ে অংশ নিয়ে বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায় এবং সামগ্রিক দারিদ্র্য মূল্যয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদান করেছেন।

আমরা পিয়ার রিভিউয়ারদের প্রতিও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ- থমাস ফারোল (প্রিন্সিপাল ইকোনোমিস্ট, সিইইউএই), মারিয়া ইউজেনিয়া জেনোনি (লিড ইকোনোমিস্ট, ইপিভিজিই) এবং হোরাসিও তের্রাজা (লিড আরবান স্পেশালিস্ট, কনসালট্যান্ট, ইএসএপিভি), তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মতামত ও গঠনমূলক পরামর্শের জন্য।

সবশেষে, এই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে হিমেনা দেল কার্পিও (প্র্যাকটিস ম্যানেজার, ইএসএপিভি), আবদুলায়ে সেক (সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর, এসিএসবিবি), জ্যাঁ পেম (বর্তমান ডিভিশন ডিরেক্টর, এসিএসবিবি), গেল মার্টিন (অপারেশনস ম্যানেজার, এসিএসবিডি), এস. আমের আহমেদ (লিড ইকোনোমিস্ট, এইচএসএএসপি) এবং সুলেমান কুলিবালি (লিড ইকোনোমিস্ট, ইএসএসি২)-এর নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনার অধীনে। তাঁদের নেতৃত্ব, সহায়তা ও উৎসাহই এই প্রতিবেদন সফলভাবে চূড়ান্ত করতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পোভার্টি অ্যান্ড ইকুইটি অ্যাসেসমেন্ট ২০২৫ প্রতিবেদনটি ২০১০ থেকে ২০২২ সময়ে বাংলাদেশে দারিদ্র্যহ্রাস এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে অগ্রগতি বিশ্লেষণ করেছে। এই মূল্যায়ন থেকে পাওয়া পাঁচটি মূল বার্তা হলো:

- ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমেছে, কিন্তু ২০১৬ সালের পর এই অগ্রগতির গতি কমেছে। দেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ যেকোনো মুহূর্তে আবার দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে যাওয়ার মতো ঝুঁকিতে রয়েছে।
- বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষকে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য থেকে বের করে এনেছে। তবে এসব সেবার মান এখনও যথেষ্ট দুর্বল। বিদ্যুতের অনিয়মিত সরবরাহ, দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা এবং ধীরগতির যোগাযোগব্যবস্থার কারণে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
- ২০১৬ সালের পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধরন বদলে গেছে। কৃষিখাত ঘুরে দাঁড়ানোয় গ্রামাঞ্চল এখন দারিদ্র্যহ্রাসে মূল ভূমিকা রাখছে, আর শহরের শিল্প ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে অগ্রগতি অনেকটাই থেমে গেছে।
- সম্প্রতি সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয় বেড়েছে, কিন্তু উপকারভোগী নির্বাচনে দুর্বলতা ও ভর্তুকি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার অভাবে এই ব্যয়ের প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।
- দারিদ্র্যহ্রাসে বাংলাদেশের সামনে নতুন একটি অধ্যায় শুরু করার সুযোগ রয়েছে। এর জন্য উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, শহরে আরও বেশি শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষিতে দরিদ্রবান্ধব মূল্যশৃঙ্খল গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন ঝুঁকি বা দুর্যোগের বিরুদ্ধে সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করার মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে।

*****

২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমেছে, তবে ২০১৬ সালের পর এই অগ্রগতির গতি ধীর হয়েছে। দারিদ্র্য কমার এই ধীরগতি অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তন এবং প্রবৃদ্ধির গুণগত মানের পরিবর্তনে মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। দারিদ্র্যে পুনরায় ফিরে যাওয়ার ঝুঁকিও এখনও ব্যাপকভাবে রয়ে গেছে। ২০২৫ সালে আনুমানিক ৩ কোটি ৬ লাখ মানুষ দারিদ্র্যের মাঝে বসবাস করছে।

অর্থনীতিতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশে দারিদ্র্যহ্রাসের গতি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ১২.২ শতাংশ থেকে কমে ৫.৬ শতাংশে নেমেছে এবং মোট দারিদ্র্যের হার ৩৭.১ শতাংশ থেকে কমে ১৮.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (এখানে জাতীয় দারিদ্র্যসীমা হিসেবে মাসিক মাথাপিছু আয় ২৭৫০ টাকা হলে নিম্ন দারিদ্র্যসীমা এবং ৩৮৩২ টাকা হলে মোট দারিদ্র্যসীমা ধরা হয়েছে)। এই সময়ে প্রায় ৯০ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্য থেকে এবং আড়াই কোটি মানুষ মোট দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। একই সময়ে প্রকৃত জিডিপি গড়ে ৬.৬ শতাংশ হারে বেড়েছে, ফলে মাথাপিছু জিডিপি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তবুও ২০১৬ সালের পর প্রবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়েছে এবং দারিদ্র্যহ্রাসের গতি ধীর হয়েছে (চিত্র ১. ক)। ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে প্রবৃদ্ধির তুলনায় বাংলাদেশের দারিদ্র্যহ্রাসের স্থিতিস্থাপকতা (অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লে দারিদ্র্য কী হারে কমছে) দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.৯, যা দক্ষিণ এশিয়ার গড় মান ১.৫ এর অনেক নীচে। অর্থাৎ প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের প্রতি ১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি থেকে তুলনামূলকভাবে কম মানুষই দারিদ্র্যসীমার বাইরে আসতে পেরেছে।

২০১৬ সালের পর দেখা গেছে, বাংলাদেশের ভোগব্যয়ের প্রবৃদ্ধিও অপেক্ষাকৃত কম দরিদ্রবান্ধব হয়েছে; এমনকি এই প্রবৃদ্ধির সুফল দরিদ্রদের তুলনায় মধ্যম এবং উচ্চআয়ের মানুষের কাছে বেশি গেছে। জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত ভোগব্যয়ের বৈষম্য, যা ব্যয়ের জিনি সহগ (অসমতা মাপার একটি সূচক) দিয়ে পরিমাপ করা হয়, জাতীয় পর্যায়ে মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল; তবে গ্রামাঞ্চলে সামান্য কমেছে

(২৯.২ থেকে ২৮.২) আর শহরে কিছুটা বেড়েছে (৩৩.১ থেকে ৩৪.৫)। সেই তুলনায় আয়বৈষম্য (যেখানে মজুরি, প্রবাসী-আয় ও সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় সবই ধরা হয়েছে) তীব্রভাবে বেড়েছে; জিনি সহগ ৫১ থেকে বেড়ে ৫৪-তে উঠেছে। এই আয়বৈষম্য শহরাঞ্চলে আরও বেশি স্পষ্ট।

বিভিন্ন ধাক্কার (শক) প্রতি উচ্চঝুঁকিপূর্ণ এই অবস্থা ২০২২ থেকে ২০২৫ সময়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও চাকরি হারানোর প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্যবৃদ্ধিতে রূপ নিয়েছে (মাইক্রো-সিমুলেশন ভিত্তিক অনুমান; চিত্র ১.খ.)। ২০২২ সালে জনসংখ্যার প্রায় ৩৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যে ফিরে যাওয়ার এই ঝুঁকিতে ছিল। অর্থাৎ সেই সময়ে অস্থিতিশীল ভোগব্যয়, সীমিত সঞ্চয় আর অপর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে কমপক্ষে ৬ কোটি ২০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার ঠিক ওপরে জীবনযাপন করছিল। ২০২২-২০২৫ সময়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ধীরগতির হওয়া এবং অদক্ষ শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মন্থরতার কারণে শ্রম আয়ের সামগ্রিক শক্তি দুর্বল হয়েছে। ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২০ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে এবং ২০২৫ সালে আরও ৮ লাখ কর্মসংস্থান কমার আশঙ্কা রয়েছে। চাকরির বাজার সংকুচিত হওয়ার সবচে বড় ধাক্কাটি পড়েছে নারী এবং তরুণদের ওপর। অতিদরিদ্রদের মজুরিবৃদ্ধির চেয়ে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে অনেক দ্রুত হারে, এমনকি করোনাকালের তুলনায় ২০২৫ সালে জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। এর ফলে, দারিদ্র্যের হার ১৮.৭% (২০২২ সালে) থেকে বেড়ে ২১.২% হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই অনুমানের ভিত্তি হলও শ্রমবাজারের গতিশীলতা, প্রবাস-আয় এবং সরকারের ভর্তুকিব্যয় একীভূত করে তৈরি মাইক্রো-সিমুলেশন মডেল।

চিত্র ১: ২০১৬ সালের পর দারিদ্র্য হ্রাসের গতি মন্থর হয়েছে, এবং প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার আবার বাড়তে পারে।

ক. দারিদ্র্যের প্রবণতা: ২০১০-২০২২ খ. দারিদ্র্যের প্রক্ষেপণ: ২০২৩-২০২৫

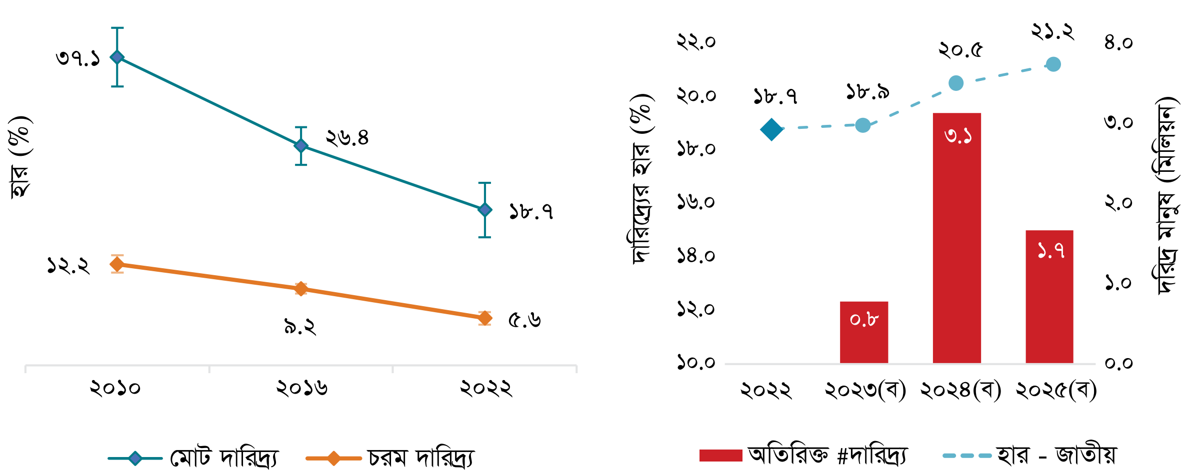

(ব) প্রাক্কলিত

উৎস: বাংলাদেশ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১০, ২০১৬ ও ২০২২-এর উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের কর্মীদের বিশ্লেষণ, এবং বিশ্বব্যাংকের Macro Poverty Outlook (২০২৫, অক্টোবর)-এ উপস্থাপিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ ব্যবহার করে সম্পাদিত মাইক্রো-সিমুলেশনভিত্তিক প্রাক্কলন।

২০১৬ সালের পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধরনে পরিবর্তন আসে। কৃষিখাতে কর্মসংস্থান বাড়ার ফলে গ্রামীণ অঞ্চলগুলো দারিদ্র্যহ্রাসে নেতৃত্ব দিতে থাকে, অথচ শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে বছরে প্রায় ১৫ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলেও এ-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তুলনামূলকভাবে কম উৎপাদনশীল খাতে।

২০১০ থেকে ২০১৬ সময়ে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশ এবং তুলনামূলকভাবে মাঝারি কৃষিপ্রবৃদ্ধির সমন্বয়ে প্রতিবছর গড়ে ১১ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, ফলে সে-সময়ে দারিদ্র্যহ্রাসে কৃষিবহির্ভূত খাতের অবদান বেশি ছিল। ২০১৬ থেকে ২০২২ সময়ে কৃষিখাত আবার ঘুরে দাঁড়ায় ,

অন্যদিকে শিল্পে প্রবৃদ্ধি কমতে থাকে। এর ফলে সামগ্রিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বেড়ে বছরে প্রায় ১৫ লাখে দাঁড়ালেও এর ৬৩ শতাংশই আসে কৃষিখাত থেকে। ফলে ২০১৬ থেকে ২০২২ সময়ে দারিদ্র্যহ্রাসের মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে গ্রামীণ এলাকা, যা দেশের কাঠামোগত রূপান্তরের আগের ধারার সঙ্গে এক ধরনের উলটো-যাত্রা। এ-সময়ে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার ৮.৫ শতাংশ পয়েন্ট কমে, যেখানে শহরাঞ্চলে এই কমা ছিল ৪.৬ শতাংশ পয়েন্ট। ফলে গ্রাম-শহরের দারিদ্র্য ব্যবধান ১৭.২ শতাংশ পয়েন্ট থেকে কমে ৫.৮ শতাংশ পয়েন্টে নেমে আসে। ২০২২ সালে এসে প্রতি চারজন দরিদ্র মানুষের একজন শহুরে বাসিন্দা।

শ্রমবাজারে অর্জিত অগ্রগতি এখনও দারিদ্র্যহ্রাসের প্রধান চালিকাশক্তি, তবে ২০১৬ সালের পর তা আর আগের মতো অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করছে না।

২০১০ থেকে ২০১৬ সময়ের তুলনায় ২০১৬ থেকে ২০২২ সময়ে দারিদ্র্যহ্রাসে শ্রম আয়ের অবদান খুব দ্রুতগতিতে কমে যায়, ৮৯ শতাংশ থেকে নেমে দাঁড়ায় ৫১ শতাংশে। এর অন্যতম কারণ ছিল কম উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ঝোঁক এবং চাকরির মানের অবনতি। কৃষিখাতে মোট কর্মসংস্থানের ৫৭ শতাংশই নারী; এর মধ্যে বিশেষ করে তরুণ, শিক্ষিত নারীরা ক্রমবর্ধমান হারে এসব গ্রামীণ চাকরিতে যুক্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে শহর এলাকায়, ঢাকার বাইরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি প্রায় থমকে যায় এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার কমে, যা নারীদের ক্ষেত্রে আরও বেশি (৩৪ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে) হ্রাস পায়। নতুন সৃষ্টি হওয়া শহুরে চাকরির বেশিরভাগই দখল করে নেয় শিক্ষিত পুরুষেরা, বিশেষ করে উৎপাদন এবং সেবা খাতে; এতে করে উৎপাদনখাতে নারীদের কর্মসংস্থান ৫.৪ শতাংশ পয়েন্ট কমে যায়, অথচ তৈরি পোশাকখাতে আগে ঠিক এর বিপরীত চিত্র ছিল। তরুণদের বেকারত্ব উচ্চপর্যায়ে রয়ে গেছে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিতদের মাঝে (পুরুষ ২৫ শতাংশ আর নারী ২৮ শতাংশ)। ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী তরুণদের অর্ধেকই কম মজুরির শিল্প ও সেবাখাতে কাজ করে, যদিও শ্রমের চাহিদা সামগ্রিকভাবে বাড়ছে। এসব তথ্য ইঙ্গিত করে যে, বিশেষত তরুণদের মধ্যে দক্ষতার সঙ্গে বাজারের চাহিদার মিল না হওয়ার (স্কিলস মিসম্যাচ) সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে।

কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসন লাখ-লাখ বাংলাদেশীর জন্য দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ এবং একই সাথে জীবনধারনের কৌশলও। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক, দুই ধরনের রেমিট্যান্সই বাংলাদেশে দারিদ্র্যনিরসনে ভূমিকা রাখছে, ২০১৬ থেকে ২০২২ সময়কালে এ দুয়ের সম্মিলিত অবদান কমপক্ষে ৩ শতাংশ দারিদ্র্য হ্রাস করেছে। অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স পাওয়া পরিবারের হার ২০১০ সালে ১২.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে ১৩.৯ শতাংশে, যা প্রায় ৪০ লাখ অতিরিক্ত পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এর বেশিরভাগ সুবিধা গেছে আয়ের দিক থেকে নিচের ৪০ শতাংশ পরিবারের কাছে। এই রেমিট্যান্স ঐসব পরিবারের জন্য দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার একটি অন্যতম সুরক্ষাবলয় হিসেবে কাজ করেছে। সেই তুলনায় প্রবাস আয় যদিও কমসংখ্যক পরিবারে পৌছায় তারপরও তা প্রায় ২ শতাংশ দারিদ্র্যহ্রাসে সহায়তা করেছে। তবে দুই ধরনের অভিবাসনেই নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ অভিবাসীরা প্রায়ই খুব সামান্য নাগরিক সুবিধা নিয়ে শহরের বস্তি ও ঘিঞ্জি এলাকায় থাকেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোয় পুরুষ শ্রমিকদের যাওয়াটা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে মূলত উচ্চ-অভিবাসনব্যয়ের ফলে আর সে-কারণেই এই সুযোগটা কেবল তুলনামূলকভাবে সচ্ছলরাই নিতে পারে।

বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং শিক্ষার সুযোগবৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ ৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষকে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য থেকে বের করে এনেছে। তবে, সেবার মান এখনও অনেক দুর্বল, বিশেষ করে বিদ্যুতের অনিয়মিত সরবরাহ, দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা এবং ধীরগতির যোগাযোগব্যবস্থা কারণে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণকে সীমিত করে দিচ্ছে।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্যসূচক যুগপৎভাবে একই সঙ্গে নানা ধরনের (বিশেষ করে শিক্ষা, অবকাঠামো সেবা এবং আর্থিক দারিদ্র্য) বঞ্চনার/বৈষম্যের মাত্রা পরিমাপ করে। বাংলাদেশে ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে এই সূচক মোট জনসংখ্যার ৪৬.৮ শতাংশ থেকে কমে ২১.৩ শতাংশে নেমে এসেছে, যা সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়। মূলত বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষ সব ধরনের বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

মৌলিক সেবার আওতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হলেও গুণগত মানে ঘাটতি এখনও ধারাবাহিকভাবে রয়ে গেছে। ২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা গেলেও অনিয়মিত ও অনির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎসরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধির পথে বড় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। একইরকমভাবে অধিকাংশ শিক্ষার্থী এখনও গণিত ও বাংলায় প্রাথমিক স্তরের দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না, ফলে বিদ্যালয়ে

ভর্তির হার ও উপস্থিতি বাড়লেও এর প্রকৃত শিক্ষাগত মূল্য অনেকটাই কমে যাচ্ছে। শহরের পরিবহনব্যবস্থা উন্নত ও সম্প্রসারিত হলেও তা চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। ফলে, বাংলাদেশের যেকোনো শহরে চলাচলের গতি পৃথিবীর ধীরগতির শহরের মধ্যে নিচের দিকেই রয়ে গেছে। এসব গুণগত ঘাটতির কারণে সেবার বিস্তৃতির থেকে যে সম্ভাব্য সুফল পাওয়ার কথা, তা পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে না আর পরিবারগুলো এই সম্পদ ও সুযোগগুলো পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে উন্নত জীবিকা ও টেকসই দারিদ্র্যহ্রাস নিশ্চিত করতে পারছে না।

বাংলাদেশে সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয় বাড়িয়েছে ঠিকই, তবে উপকারভোগী নির্বাচনের দুর্বলতা এসব ব্যয়ের প্রত্যাশিত প্রভাবকে অনেকটাই খর্ব করে দিচ্ছে। সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশ পরিবারের কেবল অর্ধেক সামাজিক সহায়তা পায়; ভর্তুকি দেওয়ার পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে তুলনামূলক সচ্ছল পরিবাররাই এর সুবিধা বেশি ভোগ করেন। ফলে, দারিদ্র্যহ্রাস ও বৈষম্য কমানোর অগ্রগতি সীমিত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিধি বেড়েছে, তবে এখনও এর ব্যবস্থাপনা ও উপকারভোগী নির্বাচন যথেষ্ট অদক্ষ। ২০১৬ থেকে ২০২২, এই সময়ে দারিদ্র্যহ্রাসের মোট অগ্রগতির প্রায় ৫ শতাংশের পেছনে এসব কর্মসূচির অবদান থাকলেও, যা ২০১০ থেকে ২০১৬ সময়ের তুলনায় বেশ উন্নতি বলা যায় কিন্তু এর আওতা এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনে দুর্বলতা রয়েই গেছে। ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বরাদ্দ দ্বিগুণ হয়েছে, কিন্তু দারিদ্র্যবিমোচনে এর কার্যকারিতা কমেছে, কারণ ক্রমশ বেশি অংশের সুবিধা সচ্ছল পরিবারে যাওয়া অব্যাহত ছিল। ২০২২ সালে সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশ পরিবারের মাত্র অর্ধেক এসব সামাজিক সহায়তা পেয়েছে। অথচ সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ পরিবারের ৩৫ শতাংশও এসব সুবিধা পেয়েছে। ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে শহরগুলোয় সামাজিক সহায়তার আওতা দ্রুত বেড়েছে, ১৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৪.৫ শতাংশ হয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে এটা বেশ ভালো, তবে সচ্ছল মানুষের কাছে এসব সুবিধা যাওয়া বন্ধ করা যায়নি।

বৈষম্যমূলক করব্যবস্থা এবং অদক্ষ্যভাবে লক্ষ্যনির্ধারিত ভর্তুকি বাংলাদেশের রাজস্ব নীতিকে দূর্বল করছে। কারণ, এসব সুবিধার সিংহভাগ ধনী পরিবারগুলো ভোগ করছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং সারভর্তুকি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশ পরিবারের ব্যয়যোগ্য আয়ের ২২.১ শতাংশের সমপরিমাণ হলেও বাস্তবে এসব ভর্তুকির সিংহভাগ সুবিধা পাচ্ছে তুলনামূলকভাবে সচ্ছল পরিবারগুলো। শহরের সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ পরিবার একাই সরকারের বিদ্যুৎ ভর্তুকিব্যয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ সুবিধা ভোগ করে। কৃষিভর্তুকি সম্পদের দক্ষ বণ্টনকে আরো প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং এর ফলে ফসলবৈচিত্র্যে নিরুৎসাহিত হয়। দরিদ্র পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের যে-বোঝা তৈরি হয়, তা সরকারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিনিয়োগ (আয়ের ৯.৭ ভাগ এবং ৬.২ ভাগ), সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীতে বরাদ্দ (আয়ের ২.৯ ভাগ) এবং পেনশন থেকে প্রাপ্ত সুবিধার মাধ্যমে কিছুটা হলেও লাঘব হয়। তবুও এসব ব্যয় নাগরিক সেবার ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক বন্টন নিশ্চিত করতে পারছে না। সরকারের ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে গুণগত মান ও দক্ষতা বাড়ানো না-গেলে, বাংলাদেশের রাজস্বনীতি কল্যাণবৃদ্ধি ও বৈষম্যহ্রাস উভয় ক্ষেত্রেই এর ভূমিকা সীমিত রয়ে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বাংলাদেশের দারিদ্র্যহ্রাস এবং আঞ্চলিক দারিদ্র্যবৈষম্যহ্রাসে অর্জিত সফলতা হুমকির মুখে ফেলতে পারে, যা ২০৫০ সাল নাগাদ ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করতে পারে এবং কৃষিখাতে জিডিপি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে।

বাংলাদেশ আঞ্চলিক বৈষম্য, বিশেষ করে দেশের পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চল এবং উচ্চদারিদ্র্যপ্রবণ এলাকাগুলোয় গরিব মানুষের সংখ্যা দ্রুততার সাথে কমেছে। তথাপি বিভিন্ন রকমের জলবায়ুজনিত ঝুঁকি ভবিষ্যতে আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়াতে পারে বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের মধ্যে। বন্যা ও খরা গ্রামীণ পরিবারের ওপর অসামঞ্জস্যভাবে প্রভাব ফেলে এবং এসব অভিঘাত থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর তাদের সামর্থ্য অনেকটাই নির্ভর করে স্থানীয় অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ওপর। আশাবাদী পূর্বাভাস মেনেও ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ুজনিত অভিঘাতের ফলে কৃষিখাতের জিডিপি এক-তৃতীয়াংশ কমে যেতে পারে এবং ১ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে, যাদের বড় অংশই দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের সদস্য। অন্যদিকে শহরাঞ্চল বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবকাঠামো সেবা খানিকটা উন্নত হয়েছে বটে তবে সেখানে বৈষম্য বাড়ছে, দারিদ্র্যহ্রাসের গতি কমেছে, ঘিঞ্জি পরিবেশ এবং পরিবেশগত চাপ বাড়ছেই।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যেসব কারণে অর্জনের গতি মন্থর হয়েছে বিশেষ করে কাঠামোগত এবং বণ্টনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারলে বাংলাদেশ দারিদ্র্যহ্রাস এবং অংশীদারিত্বমূলক সমৃদ্ধির এক নতুন অধ্যায় শুরু করার সুযোগ পেতে পারে। চারটি ফলাফল অভিমুখী অগ্রাধিকার ক্ষেত্র এ-ধরনের প্রবৃদ্ধি মডেলের পথনির্দেশ দিতে পারে, যার মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, শহর ও গ্রামের মাঝে শক্তিশালী সংযোগ ও ঝুঁকি মোকাবিলার উচ্চতর সক্ষমতার মাধ্যমে সবার জন্য বিস্তৃত সুযোগ তৈরি হবে।

১. **উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের ভিত্তি মজবুত করা :** পরিবহন, রসদ ও যোগাযোগ অবকাঠামোয় বিনিয়োগের মাধ্যমে এটা অর্জন করা সম্ভব, ফলে বাজারপ্রবেশাধিকার বিস্তৃত হবে, গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শক্তিশালী হবে, কর্মী ও প্রতিষ্ঠানকে অধিক উৎপাদনশীল মূল্যশৃঙ্খলে যুক্ত করা যাবে এবং শিল্প ও সেবাখাতে কর্মসংস্থানসৃষ্টি ত্বরান্বিত হবে।

২. **দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তৃত করা :** এজন্য দুটি পরিপূরক পথ অবলম্বন করা যেতে পারে- সহজলভ্য ঋণ, কৃষিসম্প্রসারণ সেবার আওতা বাড়ানো এবং গ্রামের মানুষের আয়বৃদ্ধিতে উচ্চফলনশীল শস্যাদি চাষে সহায়তা দেওয়া; এবং একইসঙ্গে উচ্চশিক্ষার সুযোগবৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী শিশু দিবাযত্নকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা, যাতে বিশেষ করে নারী এবং যুবাশ্রেণীর শ্রমবাজারের অংশগ্রহণ বাড়াবে। এতে করে আরও নিরাপদ ও বেশি মজুরির শহুরে কর্মসংস্থানের দিকে যাওয়ার একটা পথনকশা তৈরি হবে।

৩. **গ্রামের দরিদ্রদের জন্য কার্যকর বাজারব্যবস্থা গড়ে তোলা :** পণ্যহিমাগার, মানযাচাই, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ কৃষিভিত্তিক মূল্যশৃঙ্খল গড়ে তুলতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা গেলে কৃষি থেকে আয় বাড়বে এবং খামারবহির্ভূত উচ্চমানের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করা, ঋণপ্রাপ্তি সহজ করা এবং কৃষিতে প্রযুক্তির বহুলব্যবহার নিশ্চিত করা কৃষিতে উৎপাদনসক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হবে। এসব উদ্যোগ গ্রামে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করবে, বিশেষ করে কৃষিপণ্যে মূল্যসংযোজন ত্বরান্বিত করবে।

৪. **সমতাভিত্তিক ও দক্ষ রাজস্বনীতির মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি :** তিনটি পরিপূরক পদ্ধতির মাধ্যমে এটি অর্জন করা যেতে পারে- অপেক্ষাকৃত কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো সংহত করা এবং আওতা বাড়ানো; জলবায়ু এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় চট করে সাড়া দিতে পারে এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলা; এবং ভর্তুকি পুনর্বিন্যাস করে সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

এসব অগ্রাধিকার মিলিতভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে আরও অর্ন্তভুক্তিমূলক এবং কঠিন পরিস্থিতি সামলে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো একটি পথনকশা দিতে পারে। দেশটি এখন যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার এবং প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ দারিদ্র্যহ্রাসের ক্ষেত্রে অসামান্য অর্জন করেছে, তথাপি নিত্যনতুন জটিল এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির ফলে এসব অর্জনের স্থায়িত্ব এবং অর্ন্তভুক্তিমূলকতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। অর্জনগুলো ধরে রাখতে হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, শক্তিশালী মানবসম্পদ এবং ঝুঁকি মোকাবিলা সক্ষমতার মাধ্যমে সবার জন্য সুযোগে রূপান্তরিত করতে হবে। প্রবৃদ্ধিকে বেশি শ্রমঘন খাতের দিকে পুনর্নির্দেশ করা, সরকারি অর্থব্যয়ের গুণগত মান ও দক্ষতা বাড়ানো এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা বাড়িয়ে বাংলাদেশ তার অতীতের অর্জনগুলো সুসংহত করতে পারে এবং একইসাথে দারিদ্র্যহ্রাসের পরবর্তী পর্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। জনগণ, জনপদ এবং উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিতে কৌশলগত বিনিয়োগবৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ এমন এক ভবিষ্যত বিনির্মাণ করতে পারে- যা কেবল প্রবৃদ্ধিকে নয়, বরং সবার জন্য সমান সুযোগ, নিরাপত্তা ও অংশীদারিত্বমূলক সমৃদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা হবে।

WORLD BANK GROUP